Twentyfirst Convocation held on February 29, 1988

অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য *

মাননীয় আচার্য, উপাচার্য, অধ্যাপক মন্ডলী, সজ্জনবৃন্দ, কল্যাণীয় ছাত্রছাত্রীরা —

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোহর প্রাকৃতিক পরিবেশে বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে আমাকে আপনারা আমন্ত্রন জানিয়েছেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। উত্তরবঙ্গের যে অঞ্চলে করতোয়া নদের তীরে আমি জন্মেছিলাম ও যে সব জেলায় আমার বাল্য ও কৈশোর অতিবাহিত করেছিলাম সে-সব অঞ্চল এখন স্বাধীন প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত। আর সোনাদা, ঢাগদা, শিলিগুড়ি আমার শৈশবের সঙ্গী। বহুকাল পরে বার্ধক্যের দরজায় দাঁড়িয়ে আবার সেখানে ফিরে এলাম, এটি বড়ো আনন্দের ঘটনা।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য বিনয় দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সূচনা-পর্বে নানা কাজের সঙ্গে জড়িত করেছিলেন। তারঁ মতো পন্ডিত নিরহংকার কর্মযোগী মানুষ বেশি দেখিনি। দীর্ঘ পঁচিশ বছরে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের বহুমুখী প্রসার ও শিক্ষাগত উৎকর্ষ ঘটেছে। শিক্ষায় উত্তরবঙ্গ দ্রুত স্বাবলম্বী হয়েছে। এও আনন্দের বিষয়।

এখন ভারতবর্ষে বোধ করি সব ধরনের বিশ্ববিদ্যালয় মিলিয়ে তার সংখ্যা একশো পঁচিশ হবে। কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম-দুর্নাম নির্ভর করে ছাত্রভর্তি, অধ্যাপক নিয়োগ ও পরীক্ষা পরিচালনার উপর। এ সম্পর্কে বর্তমান অবস্থা নিয়ে কয়েকটি কথা বলব।

কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ছেড়ে দিলে বেশির ভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য হয়ে উচ্চমানের ছাত্রের অভাবে অপেক্ষাকৃত নিম্নমানের ছাত্রকে ভর্তি করতে হচ্ছে। অনেক সময় রাজনৈতিক চাপও তার পিছনে থাকে। কোনো একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীপুত্র এবং এক পশ্চিমবঙ্গের সরকারের মন্ত্রীপুত্রকে ভর্তি করা হয়েছিল কম নম্বর পাওয়া সত্বেও। দুটি যোগ্য ছাত্র এর ফলে বঞ্চিত হল। উপর মহলকে তোষণের এই অসাধু প্রচেষ্টা বন্ধ হওয়া দরকার।

একথা মানতেই হবে ভালো ছাত্র না পেলে শিক্ষকদেরও নতুন জ্ঞানার্জন বা অধ্যয়ণ-স্পৃহা কমে যায়। এই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার যুগে ছাত্র উচ্চ মানের না হলে শিক্ষার মানকে নামাতে হয়, সেটা কারো পক্ষেই শুভকর নয়।

* বিদগ্ধ শিক্ষাবিদ, সাহিত্য সমালোচক এবং প্রাক্তন উপাচার্য, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

স্নাতকস্তরের কলেজগুলিতে 'সরকারী কলেজ' ছাড়া অধ্যাপক নিয়োগ করেন 'কলেজ সার্ভিস কমিশন'। সকল প্রার্থীই চান কলকাতায় বা তার আশপাশের কলেজে চাকরি। দূরে কোথাও যাওয়া মানে যেন 'স্বর্গ হইতে বিদায়'। এই তো শিক্ষিত সমাজের একাংশের আসল গণদরদী রূপ। অন্যদিকে কলেজ সার্ভিস কমিশনের নির্বাচনও সর্বদা নিরপেক্ষ, সৎ ও রাজনৈতিক প্রভাব মুক্ত হচ্ছে না। এর ফলে স্নাতক পর্যায়ের শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর প্রতিক্রিয়া স্নাতকোত্তর শিক্ষার উপর পড়ছে। তার ফলও ভালো হচ্ছে না।

বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে যে 'মেরিট প্রোমোশন স্কিম' প্রচলিত হয়েছিল তার ফলাফলও সমালোচনার উর্দ্ধে নয় যাঁরা যথার্থই যোগ্য কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন বা প্রাদেশিক সরকার তাঁদের জন্য উপযুক্ত পদ সৃষ্টি করছেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে এই প্রোমোশন সর্বদা কাম্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যোগ্য-অযোগ্যের ভেদরেখা মুছে গেছে। যাঁরা সরাসরি প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারেননি, তাঁরা মেরিটের নামে 'অটোম্যাটিক' প্রোমোশন পেলেন। বিব্রত উপাচার্যেরা অবিরত 'চাপসৃষ্টির' ফলে কি কেন্দ্রীয় কি প্রাদেশিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সকল আইনকানুন ভেঙ্গে, 'কোটা' সিস্টেম না মেনে ঢালাও প্রোমোশন চালাতে বাধ্য হচ্ছেন। 'মেরিট' শব্দের 'আনমেরিটেড' প্রয়োগ হয়ত বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে 'স্বস্তি' আনছে কিন্তু টেনে নামাচ্ছে বিদ্যাকে।

বর্তমানে প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তন যে প্রয়োজন সে কথা সকলেই মানেন। ভারতের উপাচার্য সমিতি এ নিয়ে গবেষণা চালিয়ে যে গ্রন্থাদি প্রকাশ করেছেন তাতে একটি ঘর ভরে গেছে কিন্তু কোনো বিশ্ববিদ্যালয় সাহস করে তাদের প্রয়োগ বিশেষ ঘটান নি। পরীক্ষার প্রশ্নরচনা ও সতর্কতার সঙ্গে উত্তর পত্র পরীক্ষা করা হলে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ বিপন্ন হয় না। সময়মত ফল প্রকাশ করা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবশ্য কর্তব্য। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এসব ঘটছে না। প্রশাসন ও পরীক্ষক কেউই এর দায়িত্ব এড়াতে পারেন না।

আরো পরিতাপের বিষয় শিক্ষক সমাজের একাংশ কেন্দ্রে অথবা প্রদেশ-রাষ্ট্রে যখন যে রাজনৈতিক দল ক্ষমতাসীন তার প্রতি তাৎক্ষনিক ছদ্ম আনুগত্য দেখিয়ে ক্রমান্বয়ে বহুরূপী রদবদল ঘটিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি ঘটাচ্ছেন। আদর্শবাদী শিক্ষক হয়ত তারফলে বঞ্চনার শিকার হচ্ছেন। এর ফল অশুভ। কেননা ছাত্রেরা তো চোখের সামনে তাদের শিক্ষককে দেখছে।

শিক্ষার উন্নতি কীভাবে ঘটানো সম্ভব এ নিয়ে বহু কমিশন স্বাধীন ভারতে বসেছে। সেই কমিশনের মতামত হয় আদৌ কার্যকর করা হয়নি, অথবা ঈষৎ হয়েছে। একমাত্র কোঠারি কমিশনের মতামত অনেকাংশে গৃহিত হয়েছে, কিন্তু তাও ভারতের সর্বত্র নয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকার

প্রখ্যাত অর্থশাস্ত্রী ডঃ ভবতোষ দত্তকে চেয়ারম্যান করে যে 'কমিশন' গঠন করেছিলেন, তার মূল্যবান সুপারিশগুলির একটিও অদ্যাবধি প্রবর্তিত হয়েছে বলে আমার জানা নেই। মেরহোত্রা কমিশনের রিপোর্টে ভদ্রগোছের বেতনক্রম অধ্যাপকদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে কিছু শর্ত সাপেক্ষে। অধ্যাপকেরা তার বিরুদ্ধে ধর্মঘট করলেন ঠিক সেই সময়ে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরো সেশন।

অধ্যাপকেরা সংগত ভাবেই বেতন গ্রহণ করেননি, কিন্তু তার সঙ্গে যদি অধ্যাপনাও চালিয়ে যেতেন তাহলে তাঁদের গৌরব আরো বৃদ্ধি পেতো হঠাৎ ধর্মঘট মিটল, নতোরা নিন্দিত, বহিস্কৃত হলেন। এতে কার কতোদূর লাভ হয়েছে জানি না।

কেন্দ্রীয় সরকারের মানবসম্পদ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে 'চ্যালেন্জ অব এডুকেশন' নামে যে নতুন শিক্ষা পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল তা নিয়ে কলকাতায় গ্রেট ইষ্টার্ন হোটেলে পূর্বাঞ্চলীয় এক সেমিনার হয়। সে এক প্রহসন, পাঁচ মিনিটে বক্তব্য শেষ করতে হবে। তার ফলাফল সকলেরই জানা।

দেশকে শিক্ষায় প্রাগসর হতে হবে, দুর্বলতর শ্রেণীর মাধাবীছাত্রকে বিনাব্যয়ে উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ ও সহায়তা দান করা হবে কম্পিউটার ও হাই-টেকের সহযোগে, বিভিন্ন অনগ্রসর অঞ্চলের ছাত্রদের স্কুল পর্যায়ে জাতিধর্ম-নির্বিশেষে একসঙ্গে বসবাস করিয়ে জাতীয় সংহতি গড়ার সেষ্টা হবে-এতে নীতিগত ভাবে কারো আপত্তি থাকার কারণ নেই। কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম যদি গোড়া থেকে শুধু ইংরেজি ও হিন্দী হয়, মাতৃভাষার স্থান না থাকে তাহলে অবশ্যই আপত্তির প্রশ্ন থেকে যায়। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনায় স্থাপিত 'মডেল স্কুলে শুধু এলিট' সৃষ্টি হবে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা ঠিক হবে না। 'আয় ভিত্তিক' বিদ্যালয়ের শিক্ষা কি আমরা বন্ধ করতে পারছি? প্রতিদিন দেখছি 'ইংলিশ মিডিয়াম'স্কুল 'কনভেন্ট'স্কুল জন্ম নিচ্ছে সেখানে ছেলে মেয়ে ভর্তির জন্য অভিভাবকেরা প্রাণপাত করছেন। কেউ রোধ করতে পারছেন কি ? একসময় প্রেসিডিন্সি কলেজকে 'এলিটিজম্' স্রষ্টা বলা হোত। আমি ১৯৪৮ - ৫৮ এই দশবছর একটানা প্রেসিডেন্সি কলেজে কাজ করেছি কিন্তু বহুনিন্দিত 'এলিটিজম্' দেখেনি। আমার মনে হয় পরীক্ষামূলক ভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট অনুন্নত অঞ্চলে 'মডেল স্কুল' বা 'নবোদয়'কে গ্রহণ করে এর ফলাফল লক্ষ করায় ক্ষতি কি ?

দুটি বহুব্যবহৃত জীর্ণ বাক্য আমি আর ব্যবহার করতে চাই না — 'দারিদ্র সীমার' ও 'অশিক্ষাসীমা'র নিচে। আমরা যখন পরাধীন ছিলাম তখন বর্নজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা ছিল শত করা ৮% ভাগ। আর শত করা ৮০% ভাগ মানুষ ছিল দরিদ্র। আজ বর্নজ্ঞান সম্পন্ন মানুষের সংখ্যা প্রায় ৪০% শতাংশ, শিক্ষা, জীবিকা, গবেষণার এত সুযোগ পূর্বে কখনো ছিল না।

কেন্দ্রীয় সরকারের ও সংস্থার প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে উচ্চ পদ লাভ করায় কোনো স্থির একলব্য আগ্রহ বাঙালি ছাত্রদের মধ্যে বেশি দেখিনা। অথচ দক্ষিণ ভারতে ছাত্রেরা হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষার পর থেকে নিজেদের তৈরী করতে থাকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় 'হায়ার সার্ভিসেস কোচিং সেন্টার স্কুলে অবসর প্রাপ্ত কিছু প্রশাসক-দক্ষ শিক্ষককে আমন্ত্রণ জানাতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্যই অর্থসাহায্য দেবেন।

এই বিশ্ববিদ্যালয় বেশ কয়েকটি যুগোপযোগী ডিসিপ্লিন তাঁদের শিক্ষাক্রমে গ্রহণ করেছেন। এর সঙ্গে তাঁরা একটি 'স্কুল অব ল্যাঙ্গুয়েজেস' খুলতে পারেন। জীবিকার ক্ষেত্রে তার প্রচুর সম্ভাবনা রয়েছে। আমার যতদূর জানা আছে পশ্চিবঙ্গের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে 'থার্ড ওয়ার্ল্ড' বা 'তৃতীয় বিশ্ব' নিয়ে পূর্ণাঙ্গভাবে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা নেই। আমি মনে করি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় এই দিকে এখনই অগ্রসর হতে পারেন। এর জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন থেকে অর্থ প্রাপ্তির অসুবিধা হবে না বলে মনে করি।

আজ যাঁরা উপাধি পত্র পেলেন তাঁরা অবশ্যই স্মরন করবেন এই স্থানের সঙ্গে যাঁর পুণ্যনামের যোগ সেই রামমোহন রায়কে, ভারতবর্ষের প্রথম 'মডার্নি ম্যান'কে। মর্মগত যোগ বহন করবেন তাঁর সর্বজনীন আন্তর্জাতিক চিন্তাধারার সঙ্গে। জাতি ধর্ম বর্ণগত সংকীর্ণতা, অন্ধ পশ্চাদ্‌মুখিতা যাকে বলি 'অবস্‌কিউরান্‌টিজম্' তার বিরুদ্ধে আপনারা উঠে দাঁড়াবেন। ছোট গন্ডির শৃঙ্খল ভেঙ্গে মানুষকে শুধু 'মানুষ' বলেই শ্রদ্ধা করবেন।

দুঃসহ লজ্জার সঙ্গে আজ দেখতে হলো রাজস্থানের দেওরালায় রূপ কানোয়ারের নিষ্ঠুর দুর্দহন, যার অবসান ঘটাবার জন্য চেষ্টিত হয়েছিলেন রামমোহন রায়। যারা সেই স্বামীহীনা তরুণী বিধবাকে তাড়িয়ে নিয়ে জ্বলন্ত চিতারোহনে বাধ্য করেছিল সেই ঘৃণ্য জীবদের ক্ষমা নেই। কিন্তু তার চেয়েও কম নিন্দনীয় নয় সেই রাজনৈতিক নেতারা যারা 'সতী মাহাত্ম' ঘোষণা করেছিল জনসাধারণের কুসংস্কার ভাঙিয়ে ভোট সংগ্রহের আশায়।

তেমনি যাঁরা আজ শিক্ষিত সমাজের মুকুটমনি সেই বৈজ্ঞানিকদের অনেকে বিজ্ঞানচর্চা করেন কিন্তু ব্যক্তিগত জীবচর্যায় বিজ্ঞানকে স্থান দেন না। আমি কয়েকজন বিজ্ঞানীকে জানি যাঁরা বিজ্ঞানচর্চা পরিত্যগ করে কোনো 'ভগবান্' 'বাবা' 'মা' কে বরণ করেছেন। কেউ কেউ বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ধর্মীয় প্রতিশ্ঠানের পান্ডা হয়েছেন। মধ্যযুগীয় বাতিল করা কুসংস্কারগুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। এ বৎসর স্বামী বিবেকানন্দের ১২৫তম জন্মবর্ষ। তাঁর বলিষ্ঠ মানব প্রীতি, কর্মযোগ, কুসংস্কার বিরোধিতা প্রভৃত্তিকে বড়ো করে না দেখে তাঁকে সনাতন হিন্দুধর্মের ধ্বজাধারী রূপে প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা হচ্ছে। এই অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন স্বার্থান্বেষী শিক্ষিত

মৌলবাদিরা। মুসলিম মৌলবাদীরাও পিছিয়ে পড়ে নেই। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ভারতের প্রথম সারির ঐতিহাসিক ইরফান হবিবের বিরুদ্ধে মুসলিম মৌলবাদীদের জেহাদ এই সূত্রে স্মরণীয়। চোখের সামনে দেখছি পরমাণু বিজ্ঞানী বিভিন্ন নভোচারী গ্রহের ক্রোধ প্রশমনার্থে পাঁচ আঙ্গুলে দশটি আঙটি পরে 'শনি' পূজা করছেন। দেখছি হাইকোর্টের জজ সাহেব সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারবেন কিনা ভেবে জ্যোতিষীর নির্দেশে 'রত্ন' ধারণ করছেন। উপমন্ত্রী পূর্ণমন্ত্রী হবার জন্য 'পূজা' মানত করছেন। অন্যান্য স্টেটাস সিম্বলের মতো 'গুরু'ও এখন এক স্টেটাস সিম্বল। আধ-পচা পুঁজিবাদী সমাজে এই অভিশাপ অনিবার্য। অথচ আমাদের দেশ যখন পরাধীন ছিল, শিক্ষিত মানুষের সংখ্যাছিল কম, বিজ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটেনি তখন সাম্প্রতিক কালের মতো শক্তিহীন অন্ধতা ও বিচারহীন মূঢ়তা এত বেশিমাত্রায় দেখিনি। দুশো বছর আগে বাংলার এক বাউল গেয়েছিলেন 'আমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজেদে'। সে গান আজ আরো প্রাসঙ্গিক অযোধ্যার 'রাম জনমভূমি' ও 'বাবরি মসজিদ' নিয়ে মরামারির রণডঙ্কায়। একে রাজনৈতিক স্বার্থে জীইয়ে রাখা হচ্ছে। মহাভারতে আছে—

ধর্মবাণিজ্যকো হীনো জঘন্যোধর্ম বাদিনাম্।
ন ধর্ম ফলমাপ্নোতি য ধর্ম দোগ্ধুমিচ্ছতি।।

অর্থাৎ ধর্মকে নিয়ে যারা বাণিজ্য করে তারা জঘণ্য ধর্ম বাদী। আর যারা ধর্মকে গাভীরূপে দাঁড় করিয়ে দুগ্ধ দোহন রত তারা ধর্মের ফল পায় না। তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ধর্মতন্ত্রের, ধর্ম মোহের বিরুদ্ধে কঠোর উচ্চারণ—

ধর্মের বেশে মোহ যারে এসে ধরে
অন্ধ সে জন মারে আর শুধু মরে।
নাস্তিক সেও পায় বিধাতার বর
ধার্মিকতার করে না করে না আড়ম্বর।
শ্রদ্ধা করিয়া জ্বালে বুদ্ধির আলো
শাস্ত্র মানে না, মানে মানুষের ভালো।।
(ধর্মমোহ, ১৯২৬)

আর একটি বিষয় আমি উপাধি প্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীদের সামনে তুলে ধরতে চাই। প্রতিদিন সংবাদপত্রে দেখি বধূহত্যা, আত্মহত্যা, নির্যাতনের বীভৎস চিত্র। মুখে বলি পরমাণবিক যুগ, মহাকাশ গবেষণার যুগ, একবিংশ শতকে পৌঁছে যাবার কথা। কিন্তু কার্যত অর্থের নেশায় পণ ও যৌতুকের দাবি আকাশস্পর্শী হচ্ছে, মেয়েদের প্রতি আক্রমণের বর্বরতা ক্রমবর্ধমান। আপনাদের কাছে এই আবেদন কি রাখব না যে আপনারা এই অভিশাপ থেকে মুক্ত থাকুন, আপনাদের মর্যাদা রক্ষা করুন।

আমি অনেক অপ্রিয় কথা বলেছি, 'মা ব্রুয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্' নির্দেশ আমি মানি না। যে অপ্রিয় কথা বলেছি তা আমার হৃদয়ের বেদনা সঞ্জাত। এমন বলতে চাইনি যে আগের সবকিছু 'সত্যযুগে'র ছিল আর একালের সবই 'কলিযুগে'র। এ যুগে শ্রদ্ধাভক্তি, শ্রম-নিষ্ঠা, সৌজন্যের অদর্শ সব কিছু বিলুপ্ত হয়ে গেছে এমন 'সিনিক' আমি নই। যদিচ জানি এখন গণতন্ত্র মানেই 'ভোট তন্ত্র', জানি শাহবানু, রূপ কানোয়ার বা কানকপুরের আত্মঘাতিনী তিন ভগ্নীর অশ্রুজল সহসা শুকোবার নয়। তবু এ বিশ্বাস রাখি শিক্ষিত ছাত্র-যুবসমাজ অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন, শোষনের প্রতিবাদ জানাবেন, মনুষ্যত্বের পরিচয় দেবেন। তাঁদের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বচন পাঠাই ঃ শুভ কর্মপথে ধরো নির্ভয় গান। জয় হিন্দ্।

২৯/২/৮৮